বাংলা সংস্কৃতি: চাই আর একটি ভাষা-বিপ্লব

যুবায়ের হাসান

ইতিহাসের এক সূত্রহারা অজানা অধ্যায়ে কোনো এক ধূসর সুদুর অতীতে--- অনেক হাজার এমনকী যা অর্ধলক্ষ বছরও হতে পারে, বিশাল সমতল প্রান্তরময় এই বাংলার কোনো এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজকের বাঙালি জাতির পূর্ব-পুরুষগণ দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। আজকের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি শিহরণমূলক ও রোমাঞ্চকর মনে হলেও, এই ছিল আদি সত্য। প্রকৃতির নিয়মে, প্রটো-অষ্ট্রোলয়েড মানব শাখার অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র এই গোষ্ঠীটি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে নানা অর্থবোধক, সংকেতবাহী ধ্বনিপুঞ্জ সৃষ্টি করেছিল যা আদতে ছিল আজকের বাংলাভাষার ভিত্তি। পরবর্তীকালে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবন ও জীবিকার তাগিদে উক্ত লোকালয়ের অধিবাসীগণ সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে যেতে থাকেন এবং নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠতে থাকে। এ প্রক্রিয়াটি হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান, আন্ত: যোগাযোগের নানা প্রতিকূলতা,বৈদেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ ও স্থানিক প্রয়োজনে মূল ভিত্তি-ভাষাটির কথ্যরীতিতে নানা আঞ্চলিক রূপ ও প্রকরণের সৃষ্টি হয়। তবু নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইতিহাসের সেই সূত্রহারা অধ্যায়ের অনির্দিষ্ট কালেই, বাংলা ভাষা ও এ ভাষাকে কেন্দ্র করে এক অভিন্ন সংস্কৃতির বীজ রোপিত হয়। এ সংস্কৃতির কেন্দ্রমূলে ছিল এর ভাষা, আর অন্যান্য উপাদান বা অনুঘটক হিসাবে যুক্ত হয়েছিল এই জনগোষ্ঠীর লোকাচার, লোকধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, সঙ্গীত, নদী-পাখি-জীব-জন্তু-গাছগাছালি। এই মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানা কালের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে বাঙ্গালির সংস্কৃতি। বৈচিত্রময় লোকায়ত বাংলার নানা ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়েই তাই আজ এর রক্ত মাংস গড়ে উঠেছে।

আবহমান কাল থেকেই বাঙ্গালির পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদে, নাথ সাহিত্যে, পদাবলী ও মরমী লোক সাহিত্যে পুঁথি, গাঁথা ও কেচ্ছা-কাহিনীতে। বাঙ্গালির পরিচয় আজ মসজিদে, মন্দিরে, বৌদ্ধবিহারে। বাঙ্গালির পরিচয় আজ রাঢ়ভূমি-বরেন্দ্র-পুন্ড্রবর্ধন সমতট। এসবের একটাও বাদ দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতির ইতিহাস শেখা সম্ভব নয়।

বাঙ্গালির সংস্কৃতি বা বাংলা সংস্কৃতির সাহিত্য-ভিত্তিটি রচনা করেছেন মীননাথ, ভুসুক, শাহ্ সগীর, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, আলাওল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, তারাশংকর, জসীম উদ্দিন, জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রাহমান, সত্যজিৎ রায়সহ জানা-অজানা কবি-সাহিত্যিক শিল্পী। এঁরাই বাঙ্গালির জীবন চলার পথে দিক-নির্দেশক হতে পারেন।

বাংলার প্রাণধর্ম বাংলার মাটি হতেই উৎসারিত ও বিকশিত হয়েছে। বস্তুত: এ ধর্ম সকল সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার উর্ধে। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্ম আর ইসলামের সুফীবাদ হতে জারিত হয়েছে এই মানবতাবাদ। লালন ফকির, মুকুন্দ দাস, হাছন রাজা-রা মূলত: এই মানব ধর্মেরই জয়গান গেয়েছেন। বাংলার কবির মুখেই শোনা যায়:

নানান বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগত ঘুরে দেখলাম
সবই একই মায়ের পুত।

অথবা

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী। বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

অথবা

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

বাংলার প্রাণধর্ম এই মানবতাবাদ হলেও বাঙ্গালির বৃহত্তর জীবন প্রবাহে তা মূখ্য নয়। জনমানসে নিজ নিজ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এটা কোনো দোষের বিষয় নয়। পশ্চিমের নানা উন্নত দেশের মানুষ আজও নিজ ধর্মচরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। দুটি ভিন্ন ধর্মকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের সংস্কৃতি প্রায় হাজার বছর পার করতে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী বাংলা সংস্কৃতিকে লোকধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মবর্জিত একটি সংস্কৃতি বা মানবাদর্শ হিসাবে প্রচার করতে চান। এ ভাবনাটি সঠিক নয়, কেননা, ধর্ম একটি বৃহৎ সংস্কৃতিরই অঙ্গ এবং শরীর থেকে অঙ্গ ছেদ করে খুব বেশী সাফল্য পাওয়াও সম্ভব নয়। একটি সফল-সবল-সতেজ সংস্কৃতি প্রবহমান একটি নদীর মতো, গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই যে এগিয়ে চলে। আমাদের বাঙ্গালিত্ব নিয়ে তৎকালীন পূর্ববাংলার ধর্মপ্রাণ ভাষাবিজ্ঞানী, জ্ঞানতাপস ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণ করা যায়:

> *আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালি। এটা কোনো আদর্শের কথা নয়। এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায়, ভাষায়, বাঙ্গালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি দাঁড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।*

অনাদিকাল থেকে বাঙ্গালির বন্ধু ও রক্ষাকারী যেমন প্রথমত: বাঙ্গালি, তেমনই বাঙ্গালির শত্রুও হল বাঙ্গালি। এক শ্রেণীর বাঙ্গালির স্বার্থপরতা, মিথ্যা আত্মম্ভরিতা ও শঠতার কারণে যুগে যুগে এর সংস্কৃতির কাঠামোতে ঘাত-প্রত্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা ও বাঙ্গালির পরিচয় মুছে ফেলার জন্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই কতোনা ষড়যন্ত্র চলে আসছে। চর্যাপদের সময়ও এ ষড়যন্ত্র তুঙ্গে উঠেছিল। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় চর্যার এক মহান পদকর্তা ভুসুকুর উক্তিতে। আর্য আগ্রাসনের শিকার হয়ে অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগের পর আবার বাঙ্গালিত্ব অর্জন করে আত্মপরিচয়ে গর্বিত কবি ভুসুকু নিজেকে সম্বোধন করে বলেছেন:

ভুসুকু তুই আজি বাঙ্গালি ভইলি।

গৌড়ীয় সেন রাজাদের আমলে বাংলা ভাষায় হিন্দুধর্ম-শাস্ত্র চর্চা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সংস্কৃত ভাষা বাদে কেউ যদি অন্য ভাষায় এ চর্চা করে তবে তার শাস্তি হিসাবে পরজন্মে কৌরব নামের নরকে যেতে হবে বলে রাজকীয় ফতোয়া জারী করা হয়। পাল আমলেও সংস্কৃত ভাষা রাজভাষা হিসাবে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। পরবর্তীতে তুর্কী-পাঠান-মোগল আমলে ফারসি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যদা দেয়া হয় বটে, তবে আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক শিবনারায়ন রায়ের মতামত হল:

> শশাংক থেকে পাল বা সেন রাজারা কেউই বাংলার বিভিন্ন জনপদকে কোনো ঐক্যে বাঁধতে পারেননি। বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীর ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র্যের মুখ্য অবলম্বন বাংলা ভাষা (আদর্শ) এবং

বাংলা অক্ষরমালা এবং এ দুটিরই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে মুসলমান রাজত্বকালে। বাংলার সর্বদেশব্যাপী একটি সাহিত্যিক ভাষার রূপ নেয় পাঠান আমলে। পরে এই অঞ্চলকে অধীন করে তার সাধারণ নাম সুবা বাংলা নাম দেন মোগলরা। এক ভাষা এবং এক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালি জনগোষ্ঠি ঐক্যবদ্ধ হন বটে, কিন্তু এই ঐক্যের চেতনা প্রথম পরিস্ফূট হয়ে ওঠে উনিশ শতকে ইংরেজদের শাসনকালে।

(সূত্র: বাঙ্গালিত্বের খোঁজে এবং অন্যান্য আলোচনা, পৃষ্ঠা-১১)

ইংরেজ শাসনকালের শুরু থেকেই, বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেন এবং পাশাপাশি ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন-ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। কলকাতা-ভিত্তিক এক বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। অচিরেই এখানে ঘটে এক অভূতপূর্ব রেনেসাঁস। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী কৃতি হল মাত্র একশো বছরের মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যুগান্তকারী বিকাশ। মহা প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই অধ্যায়ের মহানায়ক।

অগ্রসরমান, সংঘবদ্ধ বাঙ্গালি জাতির শিক্ষিত একটি অংশের মধ্যে স্বদেশী চেতনার স্ফূরণ দেখা দেয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠে। সংহত বাঙ্গালি জাতিসত্তা ক্রমেই বিদেশী প্রভূদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর ঠিক তখনই, শাসন কার্য্যের সুবিধার্থে বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজে "ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি" প্রয়োগ করা হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়। এর বিরুদ্ধে সারা বাংলার নগরে-বন্দরে কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে (ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) এক স্বত:স্ফূর্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা হয়। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের চাপে পড়ে, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়, কিন্তু একই সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যেয়ে বাংলার রাজনৈতিক মেরুদন্ডটি ভেঙ্গে দেয়।

পরিহাসের বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি কখনো কোনোকালেই বাংলার সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা ছিলনা। এটি ছিল দু'দিকের দুই ব্রাহ্মণের সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া। এর ফলে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের আবেগের উলটোটা প্রকাশ পেল ১৯৪৬ সালের পারস্পরিক বিবাদ ও হানাহানিতে। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগকে পৃথক করে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন উত্থাপিত তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। অংকুরেই মৃত্যু ঘটল শরৎবসু-আবুল হাশিমদের বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নেরও। বাংলার সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু ব্রাহ্মণ আর বিকাশমান মুসলমান ব্রাহ্মণ নিজেদের স্বার্থে বাংলাকে শেষ পর্যন্ত ভাগ করেই ছাড়ল।

পূর্ববাংলা বা পূর্বপাকিস্তানে বাঙ্গালি মুসলমানদের আশা পূরণ হয়না। শুরুতেই বিপত্তির সৃষ্টি হয় রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে। উর্দুকে সারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হলে, পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবীতে এক অভূতপূর্ব গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার রাজপথ রক্তাক্ত হয়। বেশ কয়েকজন তরুণ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এর পরিণতিতে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার, কিন্তু বাঙ্গালির পূর্ণ আত্মবিকাশের সংগ্রাম বন্ধ করা সম্ভব হয় না। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে, গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয় এবং ১৯৭১ সালে পূর্ণ স্বাধীকার আদায়ের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায় লাখ লাখ নিরীহ নিরপরাধ মানুষ। অশ্রুতপর্ব এক গণযুদ্ধের শেষে, ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে

'বাংলাদেশ' নামের এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাঙ্গালির হাজার বছর ধরে লালিত স্বপ্নের একাংশের বাস্তবায়ন ঘটে।

আজকের বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা দু'টি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পরিচিতির ধারক হলেও আবহমান বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলিত উত্তরাধিকার এদের উভয়েরই উপর এসে বর্তায়। এই ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের দায় উভয়ের কেউই এড়াতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা কতোটুকু সফল? এই অঞ্চলের গণমানুষের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি আমরা কি পেরেছি নিজ সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটাতে? স্বাধীনতার এতো বছর পরও আমাদের গৌরব মাতৃভাষা বাংলাকে কি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি জীবন ও জীবিকার সকল স্তরে? আমাদের মহান ভাষা ও সংস্কৃতি কি আজ নানামুখি চাপে বিপন্ন নয়? কোন জাতির ভাষার বিপর্যয় কি সেই জাতির সার্বিক সামাজিক সংকটকে সূচিত করে না? শিকড় না থাকলে, গাছে কি লাভ?

বাঙ্গালির আগামী প্রজন্ম আজ সত্যি-ই বিপদাপন্ন। সামনে অভাবিত সামাজিক বিপদের আশংকা। বাংলাদেশের অন্যতম কবি আল মাহমুদ এর 'সোনালী কাবিন' কবিতায় তাই দেখি বাঙ্গালির অতীত, বর্তমান আর সংকটময় ভবিষ্যতের ভাষিক চালচিত্র:

যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী
একদা তারাই জেনো গড়েছিল পুন্ড্রের নগর
মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি
কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়।
আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্ব পুরুষের ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব
রাক্ষসী গুল্মের ঢেউ সবকিছু গ্রাস করে এসে
ঝিঁঝির চিৎকারে বাজে অমিতাভ গৌতমের স্তব।
অতীতে যাদের ভয়ে বিভেদের বৈদিক আগুন
করতোয়া পার হয়ে একে কঞ্চি এগোতো না আর
তাদের ঘরের ভিতে ধরেছে কি কৌটিল্যের ঘুণ ?
লালিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বার বার
বর্গীরা লুটেছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামঙ্গী, শস্যের বিপদ।

তথাকথিত বিশ্বায়নের নামে পৃথিবী-জোড়া আজ আর্থ-রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী দেশ বা জাতির আগ্রাসন প্রকট হয়ে উঠেছে। বড় সংস্কৃতি গ্রাস করছে ছোট সংস্কৃতিকে আর এভাবে পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট জাতিসত্তার আত্মপরিচয়, বিশেষত: তাদের মাতৃভাষা, যা অনেক হাজার বছরের চেষ্টা ও সাধনায় তারা অর্জন করেছিল। নিউ ইয়ার্ক ভিত্তিক ভাষা বিষয়ক বিশ্বকোষ এটলাস অব দি ওয়ান্ডস ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন ডেঞ্জার অব ডিসএপিয়ারিং এ এই মর্মে আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বড় সংস্কৃতির চাপে ও তাপে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে এ মুহুর্তে সচল ছয় হাজার আটশো নয়টি ভাষার প্রায় অর্ধেকই মরে যাবে আর এ প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে আগামী একশো বছরে প্রায় নব্বই শতাংশ ভাষাই মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়াবে।

ভূ-মন্ডলে বিরাজমান জীব-বৈচিত্র, পরিবেশ-বৈচিত্র, জ্ঞান-বৈচিত্রের মতো ভাষা-বৈচিত্রও একটি প্রাকৃতিক সত্য। এক একটা ভাষা এক একটা জাতির অভিজ্ঞতার আকর--বিপুল জ্ঞান ভান্ডার। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষাই প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থেই তাই প্রতিটি জাতি-উপজাতির মাতৃভাষার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে।

মাতৃভাষা বলেই যে কোনো মানুষ সে ভাষায় কথা বলে, তা নয়। ভাষার যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ওজন না থাকে, তবে মাতৃভাষা হলেও এর আবেদন বা প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে। ভালো চাকরি লাভের আশায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে মানুষ নিজ ভাষা ত্যাগ করে প্রয়োজনমাফিক শক্তিশালী ভাষা ব্যবহারে মনোনিবেশ করে।

পৃথিবী জুড়ে বিরাজমান এই বাস্তবতার মুখে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে আশংকিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। একথা সত্যি, বাংলাকে হারানো বা হারিয়ে দেওয়া সহজ হবে না, কেননা, কোটি কোটি সাধারণ মানুষ এ ভাষায় কথা বলে এবং হয়তো আগামীতেও বলে যাবে কিন্তু দেশী বিদেশী শক্তির চাপ, সুক্ষ্ন-কৌশল প্রয়োগ, দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব প্রভৃতি কারণে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আরো বেহাল দশা দাঁড়াবে বলে স্পষ্টত:ই প্রতীয়মান হচ্ছে।

এক সময় বাংলা সংস্কৃতির আয়তন ও পরিধি পূর্ব ভারতের এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ইংরেজ শাসনামলের প্রথম ভাগে, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খন্ড নামক সাবেক বিহারের দক্ষিণাঞ্চল ছিল বৃহত্তর বাংলারই অংশ। নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙ্গালি, অসমিয়া, উড়িয়া জাতিগোষ্ঠীসমূহ মূলত: একই জাতির বিভিন্ন স্থানিক রূপ মাত্র আর ভাষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিনটি জাতির উৎস ভাষাও অভিন্ন । অনেক হাজার বছর আগে এরা একই জনপদের বাসিন্দা ছিল।

বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতির সংহতি ও ঐক্য বিদেশী উপনিবেশবাদের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে মনে করে ইংরেজ শাসকরা বৃহত্তর বাংলা ও বাঙ্গালির বিভাজনে খড়গহস্ত হয়। মিশনারিদের মাধ্যমে, কৌশলে ইংরেজ প্রশাসন আসাম ও উড়িষ্যার কথ্য ভাষাগুলিকে সমন্বয় করে অসমিয়া ও উড়িয়া নামে দুটি পৃথক আঞ্চলিক ভাষা প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এগুলি প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতিও পায়। এদুটি অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্কুল ও কলেজে প্রতিষ্ঠিত বাংলা ভাষাকে ক্রমে ক্রমে তুলে দেওয়া হয়। হিন্দির ক্ষেত্রে ঘটেছিল এর ঠিক উলটোটি হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উত্তর ভারতের লোক-ভাষা হিসাবে প্রচলিত মৈথিলি, ভোজপুরি,বাঘেলি, বুন্দেলি, ছাওশগড়িসহ অনেক স্থানীয় ভাষার পরিচয় হরণ করে নেওয়া হয়। একদা সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন :

> বাংলাদেশের পরিমানের চেয়েও আমি বহু বহু গুনে বেশী মূল্য দেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিকে। আমার ধ্যানের বাংলা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়----পশ্চিম বাংলার গুটি কয়েক জেলাই তার বিহারভূমি নয়--- আমার ধ্যানের বাংলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যার সুদূরতম প্রান্ত অবধি----না কম বলা হল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, দিল্লী, জয়পুর যেখানেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে, ছায়া পড়েছে সেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংলা। পূর্ব বাংলাও তাই এ ধ্যানের বাংলার ভেতরে।

ক্রমশ - - -

যুবায়ের হাসান, ঢাকা, ২০/০২/২০০৭